সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● পঞ্চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ● এপ্রিল ২০১৯ ● পাঁচ টাকা

উন্নয়ন, জিডিপি, প্রবৃদ্ধি ও শুভংকরের ফাঁকি

আওয়ামী লীগ শাসনে গণতন্ত্র ও ভোট না থাকলেও, অনেকেই বলেন – দেশে এখন 'উন্নয়নের জোয়ার' বইছে। দেশের রেডিও-টেলিভিশন-পত্রিকায়, আকাশে-বাতাসে উন্নয়ন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও শুভংকরের ফাঁকি

আওয়ামী লীগ শাসনে গণতন্ত্র ও ভোট না থাকলেও, অনেকেই বলেন – দেশে এখন 'উন্নয়নের জোয়ার' বইছে। দেশের রেডিও-টেলিভিশন-পত্রিকায়, আকাশে-বাতাসে এখন একটাই খবর – উন্নয়ন। আর বেশি দিন নেই, দেশটা সুইজারল্যান্ড হলো বলে! মহাসড়কে শোভা পাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে বিশাল বিশাল বিলবোর্ড! দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) বাড়ছে হু হু করে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর ঘোষণা আসছে। বিশাল নির্মাণ প্রকল্প, ঝা চকচকে অট্টালিকা, ফ্লাইওভার, চারলেন-আটলেনের সড়ক, মেট্রোরেল, বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, ইপিজেড হচ্ছে একের পর এক। অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ – সবাই জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সার্টিফিকেট বিলাচ্ছে দাতা সংস্থাগুলো। কিন্তু উন্নয়নের এই ঢক্কানিনাদ-উল্লাস তারপরও চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অসহায় আর্তনাদ, দারিদ্র্য ও শোষণের দগদগে ঘা-কে।

দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে গত কয়েক বছর ধরে। গত অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭.৮ শতাংশ, এ অর্থ বছরে তা ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে সরকার আশা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির আকার বাড়ছে, মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। সরকার একেই উন্নয়ন বলে প্রচার করছে। কিন্তু, জিডিপি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়াটাই কি উন্নয়ন? বুর্জোয়া অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী – জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়াও, প্রবৃদ্ধির সুফল উপর থেকে থেকে চুইয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়বে, সমাজের নিচের তলায় থাকা মানুষরাও কিছু পাবে। তাতে নিম্ন আয়ের মানুষের আয় বাড়বে। একে বলা হচ্ছে – চুইয়ে পড়া অর্থনীতি (ঞৎরপশষব উড়হি ঊপড়হড়সু)। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের অনেক দেশে প্রবৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয় তরতর করে বাড়লেও, সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতি ঘটেনি। বরং বৈষম্য বেড়েছে। জিডিপি নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাপার যে মাপকাঠি, তা নিয়েই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশেও বা জিডিপির কী হাল! জিডিপি একদিকে বাড়ছে, অন্যদিকে ধনী-গরিব বৈষম্যও ক্রমাগত বাড়ছে। ৫ শতাংশ ধনী মানুষের আয় বেড়েছে ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে ৫ শতাংশ গরিব মানুষের আয় কমেছে ৬০ শতাংশ। *(সূত্র: সিপিডি গবেষণা ২০১৮) বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে ধন-বৈষম্যের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৮তম। (সূত্র: অক্সফাম, জানুয়ারি ২০১৯)*

অর্থনীতির ভাষায় জিডিপি বাড়ছে মানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে ২০১০ সালের তুলনায় বেকারত্ব দ্বিগুণ হয়েছে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। (সূত্র: আইএলও প্রতিবেদন ২০১৮) চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না হওয়ায় প্রতি বছর নতুন করে বেকার হচ্ছে ৮ লাখ কর্মক্ষম মানুষ। বাংলাদেশের বুর্জোয়া ধারার অর্থনীতিবিদরা, খোদ বিশ্বব্যাংকও এতে উদ্বিগ্ন ও বিব্রত। তারা একে বলেছেন, 'jobless growth' বা 'কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি'। আরও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে – গত এক বছরে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১৩ লাখ, যা আগের বছর ছিল ১৪ লাখ। অর্থাৎ কর্মসংস্থান বাড়ানো তো দূরের কথা, উল্টো ১ লাখ কর্মসংস্থান কম হয়েছে। (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৮)

উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ঢোল বাজালেও সরকারি কর্তাব্যক্তিরা পুরো অস্বীকারও করতে পারছেন না। কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক সম্প্রতি এক সভায় স্বীকার করেছেন, "সামাজিক খাতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলেও বৈষম্য সেভাবে কমাতে পারিনি। আমরা অবকাঠামোগত খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি, পদ্মা সেতু বানাচ্ছি, বন্দর উন্নয়ন করছি, রাস্তাঘাট উন্নয়ন করছি; কিন্তু যদি শিল্পকারখানা না হয়, তাহলে কর্মসংস্থান হবে কী করে?" (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০১৯)

উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া বাংলাদেশে কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, এশিয়ার সবচেয়ে কম মজুরিতে বেশি ঝুঁকিতে কাজ করেন গামেন্টস খাতের শ্রমিকেরা। বেকারত্ব থেকে বাঁচতে তরুণ-যুবকরা ঝুঁকি নিয়ে সাগর *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আগুন আর সড়কে মৃত্যুর মিছিল

মুনাফার বলি হচ্ছে মানুষ

গত ৩ এপ্রিল বনানীর এফ আর টাওয়ারে আগুন লেগে নিহত হয়েছেন ২৬ জন। আরও বহু লোক গুরুতর আহত হয়ে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতলে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনারও প্রায় একমাস আগে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন ৭৮ জন। বার্ন ইউনিটে এই মূহুর্তে কতজন পড়ে আছেন কেউ জানে না। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোন হিসাব এদেশে রাখা হয় না।

এফ আর টাওয়ার অগ্নিকাণ্ডের কয়েকদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার। আবরার গত বছর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছিল তার বন্ধুদের সাথে। গত বছরের ২৯ জুলাই রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ২ জন শিক্ষার্থী বাস চাপায় মারা যায়। এর প্রতিবাদে এক অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। আবরার সেই আন্দোলনের একজন কর্মী ছিল। একবছরও পার হল না, আবরারকে নিয়ে আরেকটা আন্দোলন শুরু হল।

রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের আরও অনেকেই সেদিন গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিলেন। পত্র পত্রিকায় অন্তত ১২ জনের কথা এসেছে। সেই ১২ জনের কী হলো আমরা তা জানি না। আমাদের লাশের অভাব নেই। অপচয়ের মৃত্যু এত বেশি যে আমাদের হিসাব রাখাও চলে না। নতুন লাশ আসে, পুরনো লাশ চাপা পড়ে যায়।

প্রতিদিন গড়ে ২০ জন মানুষ মারা যায় সড়ক দুর্ঘটনায়। শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর মিডিয়ায় বেশি আসে না, বজ্রপাতে কৃষকরা কিংবা গ্রাম-শহরের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নানা দুর্ঘটনায় মরলে খবর হন না বেশিরভাগ সময়ে। ছাত্রদের মৃত্যুর খবর আসে। তাদের সহপাঠীরা রাস্তায় নামে। শিক্ষিত সচেতন সমাজ আক্ষেপ করেন,'ছেলেটা বা মেয়েটা বেঁচে থাকলে হয়তো কোনদিন বড় কিছু একটা হতো।'

এই মৃত্যুগুলো খুব কষ্ট দেয় সত্য। কিন্তু এর কারণ কী? এই মৃত্যুর মিছিল কাদের সৃষ্টি? সেই আলোচনাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। না হলে বাস ড্রাইভার, বাড়ির মালিক কিংবা রাজউকের প্রকৌশলীদের উপর রাগ-বিষোদগার করতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ব। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি চক্রান্ত প্রতিহত করার ঘোষণা বাম জোটের

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারার বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক জোট-এর দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৭ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জোটের সমন্বয়ক বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড সাইফুল হক, রুহিন হোসেন প্রিন্স, মানস নন্দী, নজরুল ইসলাম, মনির উদ্দিন পাপ্পু, হামিদুল হক ও লিয়াকত আলী। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অযৌক্তিকভাবে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আয়োজন সম্পন্ন করে সরকার জনগণের সাথে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নয়ন, জিডিপি, প্রবৃদ্ধি ও শুভংকরের ফাঁকি

(১ম পৃষ্ঠার পর) পাড়ি দিয়ে ছুটছে প্রবাসে। সেখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে গিয়ে ১৩ বছরে লাশ হয়ে ফিরেছেন ৩৩ হাজার শ্রমিক। সরকারিভাবে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তিপ্রতি ব্যয় বেড়েছে ২০৫ টাকার মতো। এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় চিকিৎসায় ব্যক্তির পকেট থেকে ব্যয় এদেশে সবচেয়ে বেশি। সরকারিভাবে শিক্ষায় ব্যয়ও খুব বেশি বাড়েনি। গত ১০ বছরে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় বেড়েছে ৪৪০ টাকা। দেশে ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মে ২০১৭)

খেলাপি ঋণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এক নম্বরে। আওয়ামী লীগ সরকারের গত ৯ বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৯ গুণ। নাগরিক নিরাপত্তার বেলাতেও বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩টি দেশের মধ্যে ১০২তম। প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। আগুনে পুড়ে, বয়লার বিস্ফোরণে, বৈদ্যুতিক শকে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে গড়ে ৭০০ শ্রমিক।

কী অবস্থা পরিবেশের? ঢাকা পৃথিবীর বসবাস অনুপযোগী শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম শীর্ষে। পরিবেশ সুরক্ষায় ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯ তম। আইনের শাসনে ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২তম। উচ্চ প্রবৃদ্ধির এই এক দশকে দেশে সবচেয়ে বেশি বন উজাড় হয়েছে। শধু গাজীপুরেই এক দশকে ধ্বংস হয়েছে প্রায় ৭৯% বনাঞ্চল। (সূত্র : দৈনিক বণিকবার্তা ৪ নভেম্বর ২০১৭)

সাম্প্রতিককালে এদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্র হলো নির্মাণ খাত। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিশাল বিশাল প্রজেক্ট হচ্ছে। সেজন্য সরকার প্রচুর ঋণ করছে। সস্তা শ্রম, সস্তায় কাঁচামাল, সস্তায় গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি-জমি, ট্যাক্স হলিডে, শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে বলে দেশি ও বিদেশি কর্পোরেটরা নানা রপ্তানিমুখী শিল্প করছে। সেখানে কর্মসংস্থান সীমিত, কিন্তু শ্রমশোষণ তীব্র। সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য ১০০টি ইপিজেড করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এই ব্যবসায়ীদের জন্য সড়ক-রেল-নৌ পথে যোগাযোগের জন্য রাস্তা, ফ্লাইওভার, ব্রিজ দরকার। বাকি দুটি খাত হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও গার্মেন্টস সেক্টর। এই দুটি খাতের শ্রমিকরা ও কৃষকরাই টিকিয়ে রেখেছে দেশের অর্থনীতিকে। এগুলো কোনোটাই দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ও ইতিবাচক কিছু নয়। একমাত্র টেকসই কৃষিখাত – যেখান থেকে জিডিপি-র প্রায় ১৫% আসলেও ৪০% এর বেশি শ্রমশক্তি কৃষিতে কাজ করে। অথচ সেই খাত অবহেলিত, কৃষিতে বাজেট কম, মধ্যসত্বভোগী ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি চাষীরা ফসলের লাভজনক মূল্য পায় না।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াও বিতর্কিত। অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়লে জিডিপি বাড়ে। ঋণের টাকায় যে বিশাল বিশাল প্রজেক্ট হচ্ছে, এতে জিডিপি বাড়ছে। বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে দফায় দফায় ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে দুর্নীতি-লুটপাটের কারণে। এর ফলেও জিডিপি বাড়বে। এক রাস্তা দশবার কাটাকাটি করলেও জিডিপি বাড়ে। ফ্লাইওভার হলে, পাহাড়-বন কেটে হাউজিং করা হলে জিডিপি বাড়বে, দেশে চোরাই অর্থনীতি-মাদকব্যবসা বাড়লেও জিডিপি বাড়বে। বিনা বেতনে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করলে জিডিপি বাড়বে না, কিন্তু শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হলে জিডিপি বাড়বে। সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিলে জিডিপি বাড়বে না, কিন্তু প্রচুর বেসরকারি ক্লিনিক হলে, সেখানে মানুষের গলা কাটা হলে জিডিপি বাড়তে থাকবে।

যে উন্নয়নে মুষ্টিমেয় মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে, আর বেশিরভাগ মানুষ নিঃস্ব-রিক্ত হয়, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায়, সেটা কিসের উন্নয়ন? প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে – জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটছে কি না? সবাই শিক্ষা-চিকিৎসা পাচ্ছে কি না? পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে কি না? বেকারত্ব কমছে কি না? জীবনের নিরাপত্তা আছে কি না? সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও বিনোদনের সুযোগ মানুষ পাচ্ছে কি না?

তবে নিশ্চিতভাবেই গত ১০ বছরের আওয়ামী রাজত্বে একটা বিষয়ে উন্নতিতে বিশ্বের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আগের রাতেই ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে যে বিরাট সাফল্য কিংবা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের মত ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড সম্ভবত দুনিয়ার আর কোন দেশ করতে পারেনি!

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি চক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ব্যবসায়ীদের করছে পুরুস্কৃত। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি'র আইন ভঙ্গ করে গণশুনানি করেছে। তার আগেই জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী গ্যাসের দাম বাড়ানোর যে ঘোষণা দিয়েছে তা বেআইনি। এক বছরে একাধিকবার দাম বাড়ানো ও বিতরণকারী কোম্পানিগুলো মুনাফায় থাকলে গণশুনানির প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। তারপরও গণশুনানির আয়োজন করে সরকার-বিইআরসি একযোগে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এলএনজি ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থে দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাসাবাড়ীতে জনগণ কম গ্যাস ব্যবহার বেশি দাম দিচ্ছে। দেশের জনগণের দাবি উপেক্ষা করে বিদেশি কোম্পানিকে স্থলভাগের গ্যাস ক্ষেত্র ইজারা দিলেও দুই যুগ পেরিয়ে গেলেও তারা অনুসন্ধান-উত্তোলন করছে না। ২০১৩ সালে সমুদ্র জয় করার পরও আজ পর্যন্ত সমুদ্রের গ্যাস উত্তোলনে কার্যকর উদ্যোগ নাই, অথচ পাশ্ববর্তী দেশ বার্মা ও ভারত তাদের অংশে গ্যাস তুলছে। আবার অনুসন্ধান না করেই গ্যাসের সংকটের কথা বলে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করছে বেসরকারিভাবে। সেখানেও দুর্নীতি চলছে, ভারত ৬ ডলারে গ্যাস কিনলেও বাংলাদেশ কিনছে ১০ ডলারে আর এই বাড়তি মূল্য জনগণের পকেট থেকে আদায় করছে এবং দফায় দফায় দাম বাড়াচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের ভুলনীতি, দুর্নীতি, লুটপাটের দায় জনগণ কেন নেবে? মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারা বন্ধ না করলে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

আগুন আর সড়কে মৃত্যুর মিছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর) এ সমাজে সকল উৎপাদন, সকল ক্রিয়াকর্মের গোড়ার কথাটা হলো সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ। সমাজের নিয়মটা তাই। কারণ এটি পুঁজিবাদী সমাজ। "কমিউনিস্টরা সুযোগ পেলেই শ্রেণিসংগ্রাম-পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বোঝাতে থাকে, বিরক্ত লাগে, একঘেয়েমি লাগে" – এসব কোন কথা বলেই এই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ এটা নিয়ম। আর এই নিয়মই এই ভয়াবহ মৃত্যুর মিছিলের জন্য দায়ী।

গবেষণায় এসেছে, সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ চালকের বেপরোয়া মনোভাব (৩৭%) ও অতিরিক্ত গতি (৫৩%)। এই অতিরিক্ত গতি ও বেপরোয়া মনোভাব কেন? বাস চলে চুক্তিতে কিংবা ট্রিপ সিস্টেমে। চালকদের মাসিক বেতন-ভাতা নেই। ট্রিপপ্রতি তারা টাকা পায় অথবা চুক্তিতে সারাদিনের জন্য গাড়ি নেয়। চুক্তির টাকার বাইরে বাকি টাকা তার। হেল্পার ও তেলের খরচ দিয়ে নিজের চলার টাকা জোগাড় করার জন্য সে প্রাণপণ ছুটে। যারা ট্রিপে চলে তাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুই ট্রিপের বদলে তিন ট্রিপ দিলে টাকা বেশি আসে। কম দিলে টাকা কম। ট্রিপ বেশি দেয়ার জন্য মালিকের চাপ থাকে। অনেকক্ষেত্রে চালকদের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়। পরিবহন মালিকদের নিয়ে সভা করেছেন ঢাকা পরিবহন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এনায়েত উল্লাহ্। সেখানে বিকাশ পরিবহনের মালিক অনিসুর রহমান খান বলেছেন, "টাকার বিনিময়ে রুট পারমিট নিয়েছি। ভাড়া কমাবো কিভাবে?"

কথা ঘুরেফিরে একটাই। ভাড়া বাড়াও, খরচ কমাও – তাহলে মুনাফা বেশি আসবে। সারাদিনের চুক্তিতে মালিক বাস ছাড়বেন, তিনি কম ভাড়ায় ছাড়বেন না। চালক তা তুলতে গিয়ে বেপরোয়া হবেন, গতি বাড়াবেন। চালকের বেঁচে থাকার প্রশ্ন, মালিকের মুনাফার। আপনি রাস্তায় গাড়ি প্রতি একটা পুলিশ রাখুন, প্রতিটি গাড়িতে ক্যামেরা বসিয়ে দিন কিংবা যাই করুন – মালিকের মুনাফায় হাত না দিয়ে বিরাট বিরাট উদ্যোগ কোন মানে বহন করবে না। আনফিট গাড়ি ফিট সার্টিফিকেট কিভাবে পায়? প্রতি কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে সর্বোচ্চ ব্যয় করি আমরা আর আমাদের রাস্তার মান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। শুধু নেপাল আমাদের নিচে অবস্থান করে। এটা কিভাবে হয়? কেন আমাদের রাস্তাগুলো এত দুর্ঘটনাপ্রবণ? নকশাবহির্ভূত ভবন কিভাবে বছরের পর বছর ধরে টিকে থাকে? চকবাজার থেকে কেমিক্যাল গোডাউন সরানো যাচ্ছে না কেন? এফ আর টাওয়ার ১৮ তলার অনুমতি নিয়ে ২২ তলা করলো কেন? এসকল প্রশ্নের উত্তর একটাই – তা হল 'মুনাফা'র জন্য, সহজ বাংলায় বললে লাভের জন্য।

ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ৭২% পথচারী, এই হিসাব দেখিয়ে এখন জনসচেতনতার কাজ চলছে। বলা হচ্ছে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, জনগণ সচেতন না। আসুন আমরা আরেকটু গভীরভাবে ভাবি। এই আমজনতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া রাস্তা পার হয় কেন? ঝুলে ঝুলে বাসে উঠে কেন? সে কি জানে না, এভাবে চললে সে মারা যেতে পারে? তারপরও কেন চলে? কারণ তার 'সময় কথা বলে'। টাকায় তার এক এক মূহুর্তের হিসাব হয়। তার অফিস, তার ছোট ব্যবসা এক এক মিনিট সময়কেও ছাড় দেয় না। মুনাফা প্রতি মিনিটে কথা বলে। তার বেঁচে থাকার নামই প্রতি মূহুর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া। এছাড়া তার বাড়িতে রান্না চড়ে না, ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন হয় না।

এখন এপ্রিল মাস চলছে। এই এপ্রিল মাসের একটা দিন হলো ২৪ এপ্রিল। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিলে ধ্বসে পড়েছিল রানা প্লাজা। ভবনে চাপা পড়ে মারা যায় ১১৬৬ জন শ্রমিক। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সকালে সেখানে ঢুকতে চাননি অনেক শ্রমিক। এই ভবনে ছিল ৫টি গার্মেন্টস। সকল শ্রমিককে জোর করে ঢোকানো হয় সকালে। কারণ একদিনের কাজ বন্ধ থাকলে মুনাফা কমবে। এর পরিণতিতে এতগুলো তরতাজা মানুষ লাশ হয়ে গেল। কত লোক হাত-পা হারিয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে তা আমরা জানি না। কত ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে জানি না, স্কুলের ব্যাগ কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে কতজনকে কাজে যেতে হয়েছে তার হিসেবও কেউ রাখেনি।

এর আগে আশুলিয়ায় তাজরীন গার্মেন্টসের দেড় শতাধিক শ্রমিক পুড়ে কয়লা হলো। তারা আজ ইতিহাস। কিছুদিন পর পয়লা মে – মে দিবস। সরকারি গাড়িতে চড়ে বড় বড় নেতারা সেদিন মিটিংয়ে যাবেন, শ্রমিকদের অভিনন্দিত করবেন। তাদের শ্রমে যে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে, সেই খবর তাদের শোনাবেন। কিন্তু কার স্বার্থ দেখার জন্য তারা ক্ষমতায় আছেন – সেটা এড়িয়ে যাবেন। মালিকদের জন্য কর্পোরেট কর হ্রাস, উৎসে কর আদায় কমানো, ব্যাংক ঋণের সুদ এমনকি আসল পর্যন্ত মওকুফ তারা করবেন, কিন্তু শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর দাবি উঠলে পুলিশী দমন চলবে। দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ কিংবা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি উপেক্ষা করা হবে। এ বছরের শুরুতেই পুলিশের গুলিতে একজন গার্মেন্টস শ্রমিক মারা গেছে। অথচ তাদের দাবি খুব বেশি কিছু ছিল না। সরকারঘোষিত ন্যূনতম মজুরির সাথে মিলিয়ে অন্যান্য গ্রেডগুলোর বেতন সামঞ্জস্য করার দাবি ছিল তাদের। প্রাণ দিয়েও সে দাবি তারা আদায় করতে পারলো না।

তাই প্রাণ কোন অর্থ বহন করে না রাষ্ট্রের পরিচালকদের কাছে। তারা মুনাফার দাস। মালিকরা যেমন চান সেভাবেই তাদের রাষ্ট্রটা চালাতে হয়। কারণ তারাই তাদের টাকা দিয়ে, শক্তি দিয়ে ক্ষমতায় আনে। তাই একদিকে সাধারণ মানুষ মরে, অন্যদিকে অতি ধনী বাড়ে। ধন বাড়ছেই, কিছু লোকের হাতে জমছে অঢেল টাকা। আর তাদের অতিমুনাফার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই লাশের মিছিল বন্ধ করতে হলে – ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সামাজিক মালিকানার মানবিক সমাজ নির্মাণের কোন বিকল্প নেই।

একজন বিপ্লবীর জীবনে সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই মুখ্য

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

(ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)'র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ২১ নভেম্বর ২০১৮ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মূল ইংরেজি উদ্বোধনী ভাষণের গণদাবী-তে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ এখানে পুর্নমুদ্রিত হলো।)

কমরেডস,আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র পক্ষ থেকে আমি এস ইউ সি আই (সি)'র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি কমরেডকে অভিনন্দন জানাই। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আপনাদের সামনে রেখেছেন। আমি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করব না। আমি প্রথমে বলতে চাই, কীভাবে আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা আমি বাংলাদেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা হয়তো জানেন, ঢাকার কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের শুরু। প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে তিনি যুক্ত হন, তারপর রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর এস পি) নামে একটি মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই পার্টির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পেটিবুর্জোয়া আপসহীন সংগ্রামী ধারার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালেই তাঁরা দেখেছিলেন সিপিআই একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। তাই নতুন করে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সে পার্টিও আদতে পুরনো অনুশীলন সমিতিরই অনুসারী ছিল এবং ফলে তা বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে যান। আপনারা আমার থেকে ভালই এসব জানেন। আমি কী করে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে প্রথম এলাম তাই আপনাদের বলি।

এস ইড সি আই (সি) প্রথমে একটি প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। তারপর ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল পশ্চিমবাংলার জয়নগরে একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, যিনি পরবর্তীকালে আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে থাকতে পারেননি, কিন্তু সে-সময় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে সামিল ছিলেন, তাঁর মাধ্যমে আমি দলের সংস্পর্শে আসি। আমি শৈশবেই বাবা-মাকে হারিয়েছিলাম। খিদিরপুরের বন্দর এলাকায় আমার বড় ভাইয়ের বাসায় তখন আমি থাকতাম, সেখানেই আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই। তিনি আমাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত একটি স্টাডি সার্কেলে নিয়ে যান। সে-সময় আমি স্কুলশিক্ষার দিক থেকেও বেশ দুর্বল ছিলাম। আমি মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে এলাম, তাঁর কথাবার্তা, আলোচনা এবং তাঁর সংস্পর্শ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। মার্কসীয় বইপত্র তেমন বিশেষ পড়াশোনার দ্বারা নয়, তাঁর বক্তব্য ও তাঁর সাথে মেলামেশার মাধ্যমেই আমার মধ্যে মর্যাদাময় জীবন-যাপনের ধারণা জন্ম নেয়। আমি ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত হই। পুলিশ আমার খোঁজে একদিন আমার বাড়ি সার্চ করেছিল। আমার বড়ভাই এতে ভয় পেয়ে যান। তিনি পাকিস্তানি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ ছিলেন বলে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়ে দেন তাঁর বাড়িতে আর থাকা হবে না। সেই সময়ে এস ইউ সি আই (সি) খুবই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় ছিল। তাই কমরেডরা যে কমিউনে থাকতেন, সেখানেও আমার থাকা সম্ভব ছিল না। আমি ভাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতা সংলগ্ন বাটা এলাকার রাস্তায় কাটাতাম। কলকাতার কমরেডরা সে এলাকা জানে। আমি খবরের কাগজ পেতে রাস্তায় শুতাম। পুলিশ এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দিত। এমনি করেই তখন দিন যেত। এর মধ্যেও আমি প্রায় সবদিনই প্রবল আকর্ষণে খিদিরপুর থেকে দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে শ্যামবাজারের টালায় কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে যেতাম তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সাহচর্য পেতে। আমি তাঁর সাংস্কৃতিক, এথিক্যাল, নৈতিক আচার-আচরণের দ্বারা উদ্দীপ্ত হই। আমি জানতাম, তাঁদেরও খাওয়া-দাওয়ার সংকট ছিল। আমার তো আরও খারাপ অবস্থা, তাই তাঁদের অসুবিধায় না ফেলার জন্য দুপুরে খাবার সময়ের পরেই যেতাম। আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওই সময়ই কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড রণজিৎ ধর তাঁরাও খুব দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। রণজিৎ ধর কালীঘাটের হালদার পাড়ায় থাকতেন। কখনও কখনও আমি ও প্রভাস ঘোষ কোনও খাবার না খেয়েই পার্কে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চেও আমরা ঘুমিয়েছি। এই দু'জন কমরেড তখন নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। সামান্য খাবার পেলেও আমার জন্য ভাগ রেখেছেন। আমিও দু'চার আনা পয়সা জোগাড় করতে পারলে প্রভাসের খোঁজ করতাম, ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য। এই রকমেরই অবস্থা যাচ্ছিল তখন।

আমার মধ্যে কিছু ডেডিকেশন, মিলিট্যান্সি এবং সাহস দেখে কমরেড ঘোষ আমাকে কিছু কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। আমি সর্বদা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। কারণ চরিত্র তৈরি করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়ে সঠিক বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামই ছিল তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা, যার বহু কিছু আমি অর্জন করতে পারিনি। সেই জন্য আমার চলার পথে অনেক ব্যর্থতা আছে। তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু ধৈর্য হারাননি। তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। তখন স্বর্ণশিল্পীদের একটা বড় আন্দোলন হয়। সারা ভারত জুড়ে এক বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আমাকে স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে বললেন। আমি প্রয়াত কমরেড মাধব রায়চৌধুরীকে নিয়ে বহু জায়গায় স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে থাকলাম। তিনিও আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। অনেক মানুষকে আমরা সংগঠিত করেছিলাম। স্বর্ণশিল্পীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট দাবিপত্র তুলে ধরা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষই এই দাবি সনদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। একটি সংবাদপত্র পুরো দাবিপত্র ছাপিয়ে ছিল, পার্টির নাম সেখানে ছিল না। স্বর্ণশিল্পীদের আকর্ষণীয়, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট দাবি সনদ হিসাবে সংবাদপত্র তা প্রকাশ করে। এই আন্দোলনের পর আমাকে, কমরেড প্রভাস ঘোষকে এবং আরও কিছু কমরেডকে বীরভূম জেলায় তিনি পাঠান। সেখানে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী চাষী আন্দোলন পরিচালনা করে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশেষত তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুদের যাঁদের 'ছোটলোক' বলে ওখানকার জমির মালিকরা বলত, তাঁদের মধ্যে ও আদিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি 'দিদিমণি' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমরা তাঁদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করি। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কমরেড প্রতিভা মুখার্জীকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ শুরু করি। সেখানে কাজ করার অবস্থা তখন খুবই সংকটপূর্ণ ছিল। জোতদাররা প্রচণ্ড বাধা দিত, আমাদের মারধর করত, থাকা-খাওয়ার জায়গাও প্রায় মিলত না ওদের ভয়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষ মাঝে মাঝে আমাদের সেখানে কাজ করতে পাঠাতেন। সেখানে এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় একটি বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন 'কমিউনাল ডিস্টারবেন্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ কী ও সমাধান কোন পথে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল। এই পুস্তিকা নিয়ে আমি মুসলিম সমাজের বহু বুদ্ধিজীবী এবং নামকরা ব্যক্তিদের সাথে দেখা করি। আমি যখন দিল্লি যাই, এই বই বিশিষ্ট বামপন্থী ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকেও দিয়েছিলাম। এঁরা সকলেই বলেন, এভাবে কেউই ইতিপূর্বে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করেননি। কলকাতায় আমি কিছু যুবককেও সংগঠিত করি। একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই যুবকদের নিয়ে তোমার কী পরিকল্পনা? আমি বলি, আপনি কিছু পরামর্শ দিন। তিনি বলেন, তুমি একটা যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা কর। তখন আমি ডি ওয়াই ও সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। এরপর আমি একটা কনফারেন্সে দিল্লিতে যাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে বিশেষ কারণে দিল্লিতে পাঠানো হয়। ডি ওয়াই ও-র এক সদস্য আমাকে চিঠি দিয়ে জানান যে, তাঁর এক আত্মীয় দিল্লিতে যাচ্ছেন, গণদাবী পড়তে তাঁর আগ্রহ আছে, আমি দিল্লিতে তাঁর সাথে যেন যোগাযোগ করি। সে-সময় এস ইউ সি আই (সি)'র একজন এমপি ছিলেন কমরেড চিত্ত রায়। তাঁর কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম। দিল্লিতে যোগাযোগের ব্যক্তিরা ওই বাড়িতে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হতেন। এইভাবেই দিল্লিতে রাজ্য পার্টির কাজ শুরু হয়। একদিন কমরেড ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি আর ডি ওয়াই ও-তে নয়, এবার তোমাকে দিল্লিতে কাজের জন্য থাকতে হবে। আমি দিল্লিতে থাকতে শুরু করলাম। আমি মাঝে মাঝে পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর, মোরাদাবাদ, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জায়গায় যেতাম এবং সে-সব স্থানে বেশ কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়।

একদিন মাথুর নামে যমুনা এলাকার এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। সে গাড়ি নিয়ে এসেছিল একটি বৈঠকে কমরেড চিত্ত রায়কে নেওয়ার জন্য। সেখানে অন্য বক্তা হিসাবে সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও সি পি এম নেতা রামমূর্তিও ছিলেন। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছিল। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য জুড়ে ঘেরাও আন্দোলন চলেছিল। উত্তর ভারতেও এই ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকী ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানেও, যেটা এখন বাংলাদেশ। সেই দেশের প্রখ্যাত নেতা মৌলানা ভাসানীও ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেন। তা এক অন্য ইতিহাস, আমি তার মধ্যে যেতে চাইছি না। দিল্লির ওই সভায় ঘেরাও আন্দোলন আলোচ্য বিষয় ছিল। চিত্ত রায় তখন অসুস্থ ছিলেন। ভূপেশ গুপ্ত ও রামমূর্তি তাঁদের অন্য কাজ থাকার জন্য যাননি। আমি সেখানে গেলাম। সেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেটসহ প্রায় ৫০ জন হাজির। তাঁরা ওই এমপিদের আশায় অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে তাঁরা বললেন, আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের, ওখানে কী ঘটছে আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই। আপনারা জানেন, আমি ইংরেজিতে দক্ষ নই, তাই ভাঙা হিন্দি এবং ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠল এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ আইন ও নৈতিকতার প্রশ্নে কীভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, তা আমি বলি। এই সময়ে আপত্তি উঠেছিল যে, এই আন্দোলন আইনসঙ্গত নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার উত্তরে বলেছিলেন, যা আইনসঙ্গত, তা সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত হবে তা নয়। আবার আইনের চোখে বে-আইনি হলেও সেটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করি, তাঁরা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা আমাকে বলেন, কমরেড আমরা আপনাকে এনেছি এবং অবশ্যই দিল্লিতে ফেরার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এক রাত আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমি এক রাত নয়, ওঁদের অনুরোধে সাত দিন সাত রাত ওখানে কাটালাম। যে পোশাকে গিয়েছিলাম, সেটাই শুধু আমার ছিল। তাঁরা আমাকে জামা-কাপড় ইত্যাদি পরতে দিলেন, আমার সাথে তাঁদের কথা হল। ১৫ দিন পর আবার সেখানে গেলাম। আবারও তাঁদের সাথে অনেক কথা হল, তাঁরা দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন। আমি ঠিক করলাম এই যোগাযোগের কথা কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানাতে হবে। আমি যখন টেলিফোনে তাঁকে জানালাম, তিনি বললেন তুমি যাও, যোগাযোগ রক্ষা কর, কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও সদস্য যাবেন তাঁদের সাথে কথা বলতে। কমরেড প্রীতীশ চন্দকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আমরা তিন দিন ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনায় মূল বিষয় উঠল ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর কী হবে – জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যাঁরা সেখানে জড়ো হতেন, তাঁদের মধ্যে কিছু জন নকশাল আন্দোলনেও ঘোরাঘুরি করতেন। তাঁদের সিপিএম ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগদান করার ইচ্ছে ছিল। আমি তাঁদের সাথেও কথা বলি। দীর্ঘ কথাবার্তার পর সেই এগারো জন এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের এসইউসিআই(সি) দলের অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বারও করা হয়। একটি সাংগঠনিক কমিটি করা হয়।

দিল্লিতে কিছুদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে থাকার সুবাদে তাঁর অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনি। বিশেষ কয়েকটি ঘটনা ভুলবার নয়। তিনি সব সময়ই, আমরা যারা তাঁর সাথে থাকতাম, আমাদের সামনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কমরেড চিত্ত রায়ের যে কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম, তার পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন বিশিষ্ট আইনবিদ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানতেন, একসাথে জেলেও ছিলেন। তিনি যে পাশের ঘর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা শুনতেন এবং আকৃষ্ট হতেন – তা আমরা জানতাম না। একদিন দেখলাম, তাঁর ঘরে বন্দর শ্রমিক নেতা মাখন চ্যাটার্জী, কুলকার্নি ও শিল্পপতি পিলু মোদি এসেছেন। দ্বিজেন বাবু এসে *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মার্কিন দস্যুতার টার্গেট এবার ভেনেজুয়েলা

ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ তৎপরতায় তার কুৎসিত স্বৈরাচারী চেহারাটা আবার বিশ্বের সামনে বেআব্রু হল। ভেনেজুয়েলার মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র চলছিলই দীর্ঘদিন ধরে। সেই ষড়যন্ত্রেরই সর্বশেষ চাল হিসাবে জুয়ান গুয়াইদো, যিনি এক সময়ে স্যাভেজ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, হঠাৎই রাজধানী কারাকাসে এক বিক্ষোভ সভায় নিজেকে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করে দেন। দু'মিনিটের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট বলে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন। এবং তার দু'ঘন্টার মধ্যেই কলম্বিয়া, ব্রাজিল, পেরু প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকার মার্কিন প্রভাবাধীন সাতটি দেশ গুয়াইদোকে তাদের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে দেয়। বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না – এই বিক্ষোভ, গুয়াইদোর নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা এবং প্রথমে মার্কিন সমর্থন, আর তারপরই অন্য দেশগুলির সমর্থন, সবটাই একই মার্কিন ষড়যন্ত্রের অঙ্গ।

প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজের সময় থেকেই ভেনেজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে মার্কিন প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন নীতি নিয়ে চলতে শুরু করে। এতেই সে চক্ষুশূল হয় সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকার। তেলসম্পদে ভেনেজুয়েলা বিশ্বে চতুর্থ। তেলই তার জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। এতদিন মার্কিন ধনকুবেরদের মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলিই সেখানে 'রাজত্ব' করত। সাভেজ সেগুলির জাতীয়করণ করে তেল থেকে আয়ের অর্থ দেশের সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে থাকেন। জনকল্যাণে নতুন নতুন নীতি নেন। ধনীদের উপর আয়কর চাপান। ক্ষিপ্ত হয় দেশীয় এবং মার্কিন ধনকুবেররা। শুরু হয় সাভেজ বিরোধী ষড়যন্ত্র। কিন্তু প্রবল জনসমর্থনে সেই ষড়যন্ত্র বারেবারে ভেসে যায়। স্যাভেজের এই পদক্ষেপগুলি শুধু দেশের মধ্যে নয়, আশপাশের অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলছিল। স্যাভেজের মৃত্যুর পর মার্কিন শাসকরা ভেবেছিল ভেনেজুয়েলাকে এবার কব্জা করা যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দেশের ভিতরে ও বাইরে ষড়যন্ত্র, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতিকে স্যাভেজের ধারায় এগিয়ে নিয়ে যান। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে চালিয়ে যেতে থাকেন। দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান যতদূর সম্ভব বিনামূল্যে প্রদান করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার সরকার তেইশ লক্ষের বেশি মানুষকে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। আরও সাত লক্ষ বাড়ি তৈরি রয়েছে যা এ বছরই বন্টন করা হবে। নিকোলাস মাদুরো প্রথম জীবনে ছিলেন একজন বাস ড্রাইভার। পরে ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন। এ বছরই জানুয়ারির শুরুতে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার নেন। গত বছর মে মাসে এই নির্বাচনে তাঁর জয় আটকানোর জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দেশীয় দোসররা সব রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বিপুল সমর্থনে তিনি নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক পরিদর্শকরা নির্বাচনকে অবাধ এবং গণতান্ত্রিক বলে সার্টিফিকেট দেয়।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় ভেনেজুয়েলার জাতীয় আয় দারুণভাবে কমে যায়। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনজীবনে কিছুটা হলেও তার প্রভাব পড়ে। সরকার জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে ধনীদের উপর আরও কর চাপায়। ক্ষুব্ধ হয় ধনীরা। সাম্রাজ্যবাদ দেশের এই বিক্ষুব্ধ ধনীদের মধ্যে তাদের দোসর খুঁজে পায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মাদুরোকে 'অগণতান্ত্রিক', 'স্বৈরাচারী' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে প্রচার চালাতে থাকে। অর্থনীতির সংকটে জনজীবনে যে অসুবিধাগুলি নেমে আসে সেগুলিকে অজুহাত করে এই চক্র জনগণের একাংশকে উস্কানি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। মাদুরোর দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত রূপ নেয়। দেশীয় ধনকুবের, প্রাক্তন আমলা, প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারদের একটি অংশ মার্কিন মদতে জনগণের একাংশকে নিয়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নামে। তারা সশস্ত্র অবস্থায় দোকানপাট, বাজারে, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে প্রশাসনকে উস্কানি দিতে থাকে। তাদের লক্ষ্য বিশ্বের কাছে এটা তুলে ধরা যেন ভয়ঙ্কর কষ্টে থাকা ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমেছে এবং সরকার সেই বিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করছে। সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যম সেগুলিকে সাতকাহন করে প্রচার করছে। এরপরই 'বিশ্বস্ত সূত্রে' পাওয়া খবর উদ্ধৃত করে তারা প্রচার করতে থাকবে কত মানুষ মারা গেছে, কত জন আহত হয়েছে, পুলিশ কত মানুষকে ঘরছাড়া করেছে।

এই সব দেখিয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাদুরো নেতৃত্বকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ সাহসিকতার সাথে মাদুরো এবং তাঁর রাজত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং তারা স্বাধীনতা ও আইনের শাসন দাবি করছে। তিনি ভেনেজুয়েলার 'জনগণের' এই 'স্বাধীনতার লড়াইয়ে' সবরকম সহায়তার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স প্রচারমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন, মাদুরো শাসনে ভেনেজুয়েলার জনগণ অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অথচ ভেনেজুয়েলার জনগণের জীবনে সত্যিই যদি কোনও দুরবস্থা নেমে আসে তবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী মার্কিন নীতি। গত দু'বছর ধরে আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় মারাত্মক আর্থিক অবরোধ চালাচ্ছে। তেল বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে, ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য সহ নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানিতে বাধা দিয়ে চলেছে।

মাদুরো সরকার সাহসিকতার সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে যাচ্ছে। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মাদুরো সরকারের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। ট্রাম্প গুয়াইদোকে সমর্থন জানানোর সাথে সাথেই মাদুরো আমেরিকার সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং অফিসারদের দ্রুত দেশ ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেও ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীকে সেখানে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে' সমর্থনের নামে বিদ্রোহের আহ্বান জানালেও সে দেশের সেনাবাহিনী মাদুরো সরকারের উপরই তাদের সমর্থনের কথা জোরের সাথে ঘোষণা করেছে। গণতান্ত্রিক একটি দেশের নির্বাচিত সরকারের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করে তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে রাশিয়া। না হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে বলে ঘোষণা করেছে। চীনও একই ভাবে মার্কিন ষড়যন্ত্রের নিন্দা করেছে। নিন্দা করেছে তুরস্ক, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া। কিউবা এবং মেক্সিকো মাদুরো সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে।

দেশে দেশে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার এমন সব নজির আমেরিকার রয়েছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে ইরাক এবং লিবিয়া দুটি দেশকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে এই আমেরিকা। মারণাস্ত্র রয়েছে এই মিথ্যা অজুহাত তুলে ইরাকের তেলসম্পদ দখল করাই ছিল তার আসল লক্ষ্য। লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট গদ্দাফির মার্কিন বিরোধিতা গোটা অঞ্চল জুড়ে যে সমর্থন লাভ করছিল তাকে স্তব্ধ করতে এবং অন্যদের শিক্ষা দিতে লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে এই আমেরিকা। স্বাধীন আফগানিস্তান মার্কিন লোভে আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ১৯৭০ এর দশকের শুরুতে চিলির নির্বাচিত সালভাদর গুয়েলারমো আলেন্দে সরকারের পতন ঘটাতে মিলিটারি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল আমেরিকা। কারণ আলেন্দে ক্ষমতায় এসেই মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি এবং তামার খনিগুলির জাতীয়করণ শুরু করেছিলেন। খুন হতে হয়েছিল তাঁকে। একইভাবে ভেনেজুয়েলাতেও অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইছে আমেরিকা। তাদের লক্ষ্য চরিতার্থ করতে এবার হয়ত সরাসরি সৈন্য নামাবে আমেরিকা। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া-চীন ছাড়া অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেও সঙ্গে পেয়েছে সে।

চূড়ান্ত স্বৈরাচারী এই মার্কিন আক্রমণ ঠেকাতে আজ ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষকে এক মানুষের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাদুরো সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রপ্রিয়, স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিটি মানুষকে ভেনেজুয়েলার উপর এই নগ্ন মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করতে হবে। বিশ্বজুড়ে সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে আজ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে সেখানকার জনগণ, কোনও রকম বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। অন্য কোনও দেশে 'গণতন্ত্র ফেরানোর' দায়িত্ব আমেরিকাকে কেউ দেয়নি। আমেরিকা তার তাঁবেদারি মানতে না চাওয়া কোনও দেশের উপর ইচ্ছামতো দস্যুবৃত্তি চালাবে আর গোটা বিশ্বের সাধারণ মানুষ তা চুপচাপ মেনে নেবে না।

[সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইণ্ডিয়া(কমিউনিস্ট), সংক্ষেপে এসইউসিআই(সি) দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক গণদাবী, ৭১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা থেকে লেখাটি নেয়া]

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
বামপন্থী নারী সংগঠনগুলোর সমাবেশে
নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে
ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ৮ মার্চ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে আয়োজিত যুক্ত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-বৈষম্য প্রতিরোধে এবং রাষ্ট্র-সমাজে মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কমিউনিস্ট পার্টি নারী সেলের নেত্রী লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম নেত্র প্রকৌশলী শম্পা বসু-র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত নারী দিবসের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র'র সভাপতি সীমা দত্ত, সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম সভাপতি রওশন আরা রুশো, নারী সংহতি'র সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা চন্দ, শ্রমজীবী নারী মৈত্রীর সভাপতি বহ্নিশিখা জামালী, বিপ্লবী নারী ফোরাম যুগ্ম আহ্বায়ক আমেনা আক্তার, শ্রমিকনেত্রী জলি তালুকদার, এড. জান্নাতুল মরিয়ম তানিয়া, রাশিদা বেগম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে পাঁচ শতাধিক নারীর অংশগ্রহণে একটি র‍্যালী প্রেসক্লাব থেকে তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন প্রদক্ষিণ করে।

শহীদ শামসুজ্জোহা স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন

শহীদ ডা.শামসুজ্জোহা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বুদ্ধিজীবী শহীদ। ছাত্রনেতা আসাদ,মতিউরের রক্তে তখন জেগে উঠেছিল সম্পূর্ণ দেশ, তারঁ সম্মুখভাগে ছিলেন তৎকালীন ছাত্ররা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও উত্তাল হয়ে উঠে ছাত্র আন্দোলনে। এর মধ্যেই জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহরুলকে। সাথে সাথে আরোও উত্তাল হয়ে উঠে দেশ। মাওলানা ভাসানী পল্টনের সমাবেশ থেকে হুঙ্কার দিলেন প্রয়োজনে ফরাসি বিপ্লবের মত জেলখানা ভেঙ্গে রাজবন্ধীদের মুক্ত করা হবে। শুরু করলেন বিখ্যাত 'জ্বালাও-পোড়াও-ঘোরাও' আন্দোলন। এই আন্দোলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আলোড়িত করল। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর দমন-পীড়ন-গ্রেফতার চলত। ১৫ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রদের উপর হামলা এবং আহত ছাত্রদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। শামসুজ্জোহা সেই ছাত্রদের সাথে ছিলেন,ফিরে এসে বলেছিলেন ছাত্রদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে আমি উজ্জিবীত, ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগার আগে আমার গায়ে গুলি লাগবে। ১৮ফেব্রুয়ারি যখন ছাত্র পুলিশ মুখোমুখি তখন বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়ালেন তিনি। আইয়ুবের পেটুয়া বাহীনিকে বললের 'ডোন্ট ফায়ার'। কিন্তু তার শামসুজ্জোহার কথা না মেনে গুলি করতে উদ্ধত হয়। পাক সেনারা শামসুজ্জোর উপর শুধু গুলিই চালায়রি, বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। শহীদ হন তিনি। এই মহান মানুষটি যুক্ত ছিলেন মহান ভাষা আন্দোলনে,বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যে ডাক পেলেও শুধু দেশমাতৃকাকে ভালবেসে থেকে যান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ আমরা ভুলতে বসেছি তাঁকে। শাসক গোষ্ঠি অত্যন্ত কৌশলে এ কাজ করছে। এই অবরুদ্ধ সময়ে শহীদ শামসুজ্জোহার চেতনা ছড়িয়ে দিতে ঢাকার মিরপুরের কল্যাণপুরে 'শহীদ শামসুজ্জোহা স্মৃতি পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা শ.ম.মাহাবুব ইসলাম, কল্যাণপুর গার্লস স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক জুলফিয়া হাবিব, রাশেদ শাহরিয়ার, অতনু মুখার্জী ও আশরাফুল ইসলাম।

‘নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন : নাগরিক সমাজের ভাবনা ও করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময়

আওয়ামী লীগের অতি বিজয় অর্জিত হয়েছে ঘৃণ্য ও কলঙ্কজনক পথে

বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ২৮ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন : নাগরিক সমাজের ভাবনা ও করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাম জোটের পক্ষ থেকে বলা হয় – ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন ভোটডাকাতি হয়েছে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অতি বিজয় অর্জিত হয়েছে ঘৃণ্য ও কলঙ্কজনক পথে। আগের রাতে ব্যালটবাক্স ভর্তি করার এ নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন দিতে হবে। গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষার স্বার্থে জনগণের ম্যাণ্ডেটবিহীন আওয়ামী লীগ সরকার অবিলম্বে পদত্যাগ করে সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ‘নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার’ গঠন করে তার অধীনে নির্বাচন করতে হবে।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও সিপিবি’র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ড. শাহদীন মালিক, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, সুজনের সমন্বয়কারী দিলীপ সরকার, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী)’র সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, বাসদ সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেন, পৃথিবীর দুইশোটি দেশের মধ্যে পঞ্চাশটি দেশে গণতন্ত্র আছে, বাকিগুলোতে স্বৈরতন্ত্র চলছে। বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মিছিলে ঢুকে গেছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ভয় এবং লোভ ব্যবহার করে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গদের দুর্নীতিগ্রস্থ করেছে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সুবিধা নিয়ে পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্বাচনে অতি বিজয় অর্জন করেছে। ব্যাংক মালিক আর গার্মেন্টস মালিকদের সমিতির প্রত্যক্ষ মদদে, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সহযোগিতায় জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে আওয়ামী লীগের এ বিজয়। তিনি বাম জোটের নেতা-কর্মীদের ভোট ডাকাত সরকার এবং তাদের জাতীয় সম্পদ লুটপাটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বাংলাদেশ অন্ধকার পথে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে আমাদের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। অধ্যাপক আকাশ বাম জোটকে ‘আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব’ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের দিন সহিংসতা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। কিন্তু সহিংসতা চলেছে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগ থেকেই। এ হচ্ছে প্রলম্বিত সহিংসতা। ভয় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে নির্বাচিত হওয়ার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করেছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

ডাকসু: ভোট জালিয়াতির নির্বাচন

(শেষ পৃষ্ঠায়র পর) রুটি খাওয়াচ্ছে। লাইনের মধ্যে দুই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কেন্দ্রের সামনে দেখা যায় ফাঁকা। প্রভোস্টকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘ভোট সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে, এখন পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। ছাত্ররা সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।’ সেই ‘সুষ্ঠু’ ভোটের ভিডিও ক্লিপস্ যমুনা টিভির সাংবাদিক যখন নিতে যায়, তখন তার সাথে কী রকম আচরণ করা হয়েছে এবং তার প্রশ্নের জবাবে প্রভোস্ট কী উত্তর দিয়েছেন, তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাই দেখেছেন।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন ছিল দখলদারিত্বমুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলতে হলগুলোতে ও ক্যাম্পাসে শুধুমাত্র ছাত্র সংগঠনগুলোর মিছিল-সমাবেশ ও প্রচার-প্রচারণার অধিকারকে বোঝায় না। প্রতিটি ছাত্র যেন নির্ভয়ে চলতে পারে, নিজেদের কথা নিজেরা বলতে পারে, কাকে সমর্থন করবে বা করবে না, তা যেন ঠিক করতে পারে। অর্থাৎ সেটা যেন কোনো সংগঠন জোর করে তার উপর চাপিয়ে দিতে না পারে। অথচ হল ‘গণরুম’-‘গেস্টরুম’গুলোতে ছাত্রলীগের অন্যায় কর্তৃত্ব বিদ্যমান। নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রলীগের নেতারা গেস্টরুমগুলোতে (টর্চার সেল) ছাত্রদের জোরপূর্বক নিজেদের প্রার্থীদের নাম ও ব্যালট নম্বর মুখস্থ করিয়েছে। এ অত্যাচারের শেষ কোথায়?

আরেকটি অভূতপূর্ব বিষয় হলো প্রার্থীদের এজেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি এ নির্বাচনে। ভোট দেওয়ার পর অমোচনীয় কালির ছাপ আঙুলে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রলীগ নিজেদের লোক দিয়ে কৃত্রিম লাইন তৈরি ও জটলা তৈরির সুযোগ পায়। এ কাজে তারা গণরুমের ছাত্রদের বাধ্য করে। ছাত্রলীগের নেতারা অনাবাসিক ছাত্রদের ভোট দিতে বাধা দেয় এবং নিরুৎসাহিত করে। ভোট দিতে অধিক সময় ব্যয় করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দেওয়ার মতো ঘটনা ছিল সাধারণ এবং এর মধ্যে অনেক ভোটার বিশেষ করে অনাবাসিক ভোটাররা নিরুৎসাহিত হয়। ভোটারদের লাইনগুলো প্রশাসনের তদারকি করার কথা থাকলেও ছাত্রলীগের নেতারা শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ভোটারদেরকে তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে।

গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটি, আচরণবিধি সংক্রান্ত কমিটি এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেসকল শিক্ষক যুক্ত ছিলেন, তাঁরা মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থক (নীল দলের সমর্থক)। এরকম দলকানা শিক্ষকদের প্রাধান্যে রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে ছাত্ররা শুরু থেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই প্রশাসন ও এসব শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল ছাত্রলীগের সহযোগীদের মতোই।

ফলে ছাত্রলীগ ব্যতীত সমস্ত সংগঠন ও প্যানেল নির্বাচনের দিনই বেলা একটায় অনিয়ম, কারচুপি ও জালিয়াতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে নির্বাচন বয়কট করে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলে। নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা অবস্থান করে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল সবগুলো হলের ভোট গণনা সন্ধ্যার মধ্যে শেষ হলেও যথাযথ সময়ে ডাকসু ফল প্রকাশ করা হয়নি। মধ্য রাত গড়িয়ে প্রায় শেষরাতে অর্থাৎ রাত সাড়ে তিনটায় নুরুল হককে ভিপি ঘোষণা করে ফল প্রকাশিত হয়। যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হতো তাহলে পুরো প্যানেলেই ছাত্রলীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটতো। তবু ফল ঘোষণায় বিলম্বসহ প্রশাসনের সার্বিক আচরণে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন মহলে ধারণা তৈরি হয় এই ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে প্রশাসন সাজানো একটা ফল ঘোষণা করেছে। এটা খুব আশার কথা যে, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ অনিয়মের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে ধারাবাহিক আন্দোলন চলতে থাকে। তবে যেকোনো আন্দোলন সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ছাত্রের অংশগ্রহণ এবং আন্দোলনের সামনে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সঠিক নেতৃত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে প্রশাসন ও ছাত্রলীগ অন্যায় করছে– তাদের সংগঠন আছে এবং তারা সংগঠিত। এই অন্যায়কে রুখতে হলে দরকার দীর্ঘ ধারাবাহিক ও সংগঠিত আন্দোলন। শুধু স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলনকে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এজন্য দরকার সংগঠিত অবস্থান ও পাল্টা সংগঠন।

তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়ার নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাসুদ রানা ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার ২১ মার্চ এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা না রাখার নির্দেশ এবং অর্থমন্ত্রীর শিক্ষা খাতকে বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন – দেশ যে স্বৈরাচারী কায়দায় চলছে প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের নির্দেশ আবারও তা প্রমাণ করল। ইতোপূর্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা প্রবর্তন এবং ঢাকার সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্তি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে হয়েছিল। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কারো মতামত না নিয়ে অগণতান্ত্রিক কায়দায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কতটা ক্ষতিকর তা উপরোক্ত দুটি বিষয়ে দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এরপরও সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কোন পূর্বালোচনা বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কারো মতামত না নিয়ে আবার এ ধরনের নির্দেশ জারি ভবিষ্যতে সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে।

দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এবং সারাদেশের অভিভাবক- শিক্ষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবীরা যখন শৈশব ধ্বংসকারী পিইসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সরব, তখন মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা ধ্বংসের নতুন কৌশল হিসেবে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়ার এ নির্দেশ জারি করা হয়েছে। পরীক্ষা না রাখার যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে শিশুদের পরীক্ষার চাপ কমানোর কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি পিইসির মত একটি বোর্ড পরীক্ষা শিশুদের উপর ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরী করেছে। শুধুমাত্র এমডিজি, এসডিজি -র লক্ষ্য পূরণ হয়েছে দেখানোর জন্য এবং কোচিং গাইড ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে পিইসি পরীক্ষা বহাল রাখা হয়েছে। ফলে পরীক্ষার চাপ দূর করা এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য নয় এটা স্পষ্ট। আবার বলা হচ্ছে, কিণ্ডারগার্টেন থেকে শিশুদের সরকারি বিদ্যালয়মুখী করতে এ পদক্ষেপ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়সমূহকে ক্রমাগত দুর্বল করে বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। ফলে ব্যাঙের ছাতার মত সারাদেশে কিণ্ডারগার্টেন, কোচিংসহ নানা নামের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে। এখন তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা না থাকলে স্বাভাবিকভাবে সরকারি স্কুলে পড়াশোনার গুরুত্ব ও মান কমবে। তখন মানুষ আরও বেশি মুনাফা নির্ভর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরীব সাধারণ মানুষ। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি সেখানে শাসকগোষ্ঠী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা তুলে দেয়ার ফলে শিক্ষার মান নিম্নগামী ও বেসরকারি খাত নির্ভর হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পাশ ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করছে ঐ দেশের সাধারণ জনগণ। পার্শ্ববর্তী দেশে এই অভিজ্ঞতা থাকার পরও সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ আদতে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যের অংশ।

প্রধানমন্ত্রী তার নির্দেশে ফিনল্যান্ডসহ উন্নত বিশ্বের আদলে শিক্ষা ব্যবস্থা সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ, আমরা জানি ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ওখানে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ছাত্রীদের ইউনিফর্ম, খাবার, যাতায়াত, বই, খাতা, কলম সবকিছু রাষ্ট্র সরবরাহ করে। এসবের কোন কিছুর ব্যবস্থা না করে শুধু ফিনল্যান্ডের আদলে পরীক্ষা তুলে দিলেই শিক্ষার মান বাড়বে না। আমাদের দেশের বাস্তবতানুযায়ী স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে শিক্ষকসহ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এদেশের বর্তমান বাস্তবতায় পরীক্ষা ও পাশ-ফেল না থাকলে স্কুলে পড়া ও পড়ানোর তাগিদ থাকবে না। পরীক্ষাভীতি দূর করতে অবিলম্বে পিইসি পরীক্ষা বাতিল করা দরকার। অথচ সেটা না করে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়ার অযৌক্তিক নির্দেশ দেয়া হল। প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় বুনিয়াদী শিক্ষা। অথচ আমাদের দেশে বরাবর এটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই, স্বৈরাচারী নির্দেশ জারি করে।

এরইমধ্যে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে গত ১৯ মার্চ অর্থমন্ত্রী প্রাক বাজেট এক আলোচনায় শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে একে বেসরকারি খাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান। তিনি আরও বলেন, শিক্ষাক্ষেত্র এখন একটি ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা। আমরা তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এদেশের ছাত্রসমাজ ভাষা আন্দোলন, ৬২র শিক্ষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ’৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারের দাবি উচ্চকিত করেছে। এই দেশে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে এধরনের বক্তব্য ধৃষ্টতাপূর্ণ। অবিলম্বে অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য এ দেশের মানুষের শিক্ষার অধিকার হরণের ধারাবাহিক পদক্ষেপের নতুন কৌশল।

নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক স্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইন করে নিষিদ্ধ করে দেশের সকল শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একইধারার প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানান। পরীক্ষার চাপ কমাতে এ বছর থেকে পিইসি পরীক্ষা বাতিল, তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার রাষ্ট্রীয় অপকৌশলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সহ সকলের প্রতি আহবান জানান।

একজন বিপ্লবীর জীবনে সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই মুখ্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর) কমরেড শিবদাস ঘোষকে ডেকে নিয়ে গেলেন, কারণ তাঁর ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিরা মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যাওয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে বলেন, মার্কসবাদের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ উত্তরে বলেন, মার্কসবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। কোনও বিজ্ঞান কি আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পেরেছে যে, মার্কসবাদ ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক? এরপর তিনি মার্কসবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা সেখানে করেন। ওঁরা সব চুপ হয়ে যান। দ্বিজেনবাবু এই আলোচনায় এতই মুগ্ধ হন যে, দিল্লিতে তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট পরিচিতদের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনার উদ্যোগ নিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন, যাঁর নাম আজ আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি প্রায়ই আসতেন, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্রের পথের দাবি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠির সমালোচনা করেন। এতে ওই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হন। কারণ তিনি প্রবল রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন আলোচনা করছিলেন, তখন ওখানে উপস্থিত দু'জন কমরেড সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ওই আলোচনায় ঢুকে যায়। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে ওই ভদ্রলোক রেগে চলে যান। লক্ষ করলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষ ওই দুই কমরেডকে কিছু বললেন না, কিন্তু নিজে তিনি খুব অস্থির হয়ে যান ওই ভদ্রলোককে সত্যটা বোঝাতে না পারার জন্য। এর আগেও দেখেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন যাকে যে সত্য বোঝাতে চাইতেন, যতক্ষণ সে বুঝতে না পারত, ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রেখে আলোচনা করে যেতেন।

আর একটি ঘটনাও আমার মনে দাগ কেটে আছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা শুনে অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একজন ছাত্র কোয়ার্টারে এসে দেখা করে প্রশ্ন করেন, অঙ্কশাস্ত্রের সাথে ডায়ালেক্টিকসের কী সম্বন্ধ আছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রাঞ্জলভাবে তাকে সেটা বুঝিয়ে দেন। এর দ্বারা সেই ছাত্রটি এতই আকৃষ্ট হয় যে, দলের সাথে কাজে যুক্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন আমার কাজের সাথে ছিল।

এরপর হরিয়ানাতেও যাই, পার্টির কাজ শুরু হয়। কমরেড সত্যবান এই সময়ে পার্টিতে আসেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখন গোটা হরিয়ানা জুড়ে এসইউসিআই (সি) পার্টির সংগঠন আছে। আমি চলে আসার পর ওখানে পার্টির আরও বিস্তৃতি হয়।

১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে পর পর দু'টি বিধানসভা নির্বাচন হয়। আমি সেই কাজে অংশগ্রহণ করি। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তিনি ভারতীয় জনগণকে সচেতন করেন যে, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্পর্কে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। রাজনৈতিক মহলে এই আন্দোলন নিয়ে নানা রকম মতামত ঘোরাফেরা করতে থাকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ভারতের কংগ্রেস সরকার ভারতের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আধিপত্য বিস্তার করতে পাকিস্তানের বিভাজন চাইছিল। এই সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি অনেকদিন বাংলাদেশে তোমাদের বাড়িতে যাওনি। তুমি তো কিছু বইপত্র নিয়ে ওই দেশের নানা শক্তির সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার। তাঁর কথায় তিনদিন পরে বাংলাদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। আমি তখন বাংলাদেশের প্রায় কিছুই জানি না। অতি শৈশবে আমি সেখান থেকে চলে আসি, তারপর আর কখনও বাংলাদেশে যাইনি।

বাংলাদেশ একটু ভিন্ন ধরনের দেশ। ভারতে মানুষের সাহায্য পাওয়া অনেক কঠিন। সে তুলনায় বাংলাদেশের মাটি খুব নরম। বেশ কিছু খুবই দয়ালু মানুষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছে। না না, আমি ভারতের মানুষের দোষ দিচ্ছি না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি ভারতের মানুষের মহত্ত্বের কথা বলি। তবুও বলব, বাংলাদেশ খুবই নরম মাটির জায়গা ছিল। তাঁরা আমাকে প্রভূত সাহায্য দিয়েছেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন সেখানে ছাত্রলীগ নামে ছাত্রদের একটি সংগঠন ছিল। বাস্তবে তা ছিল মুসলিম লীগেরই ধারা। আগে এদের মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ বলা হত। তারপর নাম বদলে ছাত্রলীগ বলা হয়। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল, তারপর তিনি শুধু আওয়ামী লীগ নাম দেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর এবং সোহরাওয়ার্দী আদ্যোপান্ত সাম্প্রদায়িক ছিলেন। ১৯৪৬-এর রায়টের সাথে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের নেতা এবং শিক্ষক ছিলেন। আপনারা মুজিব সম্বন্ধে জানেন। আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তিনি সেক্যুলারিজম, ন্যাশনালিজম, সোস্যালিজম এবং গণতন্ত্র – এইসব বলতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলিম জনগণের ঐক্য তাঁকে সেক্যুলারিজমের স্লোগান তুলতে বাধ্য করে। এই ধরনের স্লোগান তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি আদতে সেক্যুলার ছিলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালের বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের গর্ভে জন্ম বাংলাদেশ ন্যাশনালিজম বলে অভিহিত করেন। যদিও তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। বাংলাদেশে যাবার পর আমি ছাত্রলীগের একাংশের নেতাদের সাথে দেখা করি। তারা তখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ প্রভাবে শ্রেণীসংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং সমাজ বিপ্লবের স্লোগান তুলছিল। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন হিসাবে তাদের সাথেই ছিল। আসলে তারা তখন ছিল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী। তখন এটাই ছিল অগ্রগণ্য গণতান্ত্রিক শক্তি। আমি বাংলাদেশে মুজিব মেকার হিসাবে খ্যাত সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা করি। তিনিই আড়ালে থেকে মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেন। সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা অবশ্য এখন বাংলাদেশকে নৃশংসভাবে শাসন করছেন, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করছেন। আমি তখন সিরাজুল আলম খানকে বলি, আপনি সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল ছাড়া কেমন করে সমাজতন্ত্র আসবে? আমি তাঁদের এই মতবাদ বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাঁরা একমত হন যে, অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকা প্রয়োজন। তখন তিনি কমিউনিস্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি নামে একটি বিপ্লবী কোর গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। এই মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনবার কলকাতায় এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন যে, সিরাজুল আলম খান একজন স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ভালো সংগঠকও। কিন্তু তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান এত দুর্বল যে, তিনি আন্দোলন পরিচালনা করলে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটবে। এটা বাস্তবে ঘটেছেও। তিনি সত্যিই অনেক ভুল করেন। ... একটি সমস্যা আমি সর্বদা বাংলাদেশে লক্ষ করি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা তাঁদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। যাঁরা অনেকেই পরিচিত নেতা, ছাত্র এবং আওয়ামী লীগেরও নেতা, তাঁরা আমার আহ্বানে সাড়া দেন। কিন্তু যখনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্রশ্ন আসে, তখন তাঁরা নানা অজুহাত তুলে বা যুক্তি খাড়া করে পিছিয়ে যান। তাঁরা তত্ত্ব বা যুক্তি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু তা জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন।

আমাদের সাথে প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বেশ কিছু ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির। আমি তাঁদের বললাম, আমাদের একটা সর্বহারা শ্রেণির পার্টি গঠন করতে হলে শোষিত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে হবে। সেই সময়ে আমার আস্তানা ছিল এক বিরাট বস্তিতে। হাজার লোক সেখানে থাকতেন, শুধু একটা শৌচাগার ছিল। শোষিত নিপীড়িত মানুষেরাই অগ্রগণ্য বিপ্লবী শক্তি হয়। তাদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের তাঁদের নিকটে থাকতে হবে। তখন অন্যরা আমার কথা মানতে পারেননি। একজন বললেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, সারা দেশে সকলেই আমাকে জানে। আমি কেন বস্তিবাসীদের মধ্যে জীবন কাটাতে যাব। বুঝিয়ে বললাম, যদিও আপনি একজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, কিন্তু আপনি বিপ্লবী ও আপনি একটা বিপ্লবী পার্টির জন্য কাজ করছেন। সুতরাং আপনার সেখানে যাওয়া উচিত। এভাবে অনেক মানুষ সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের যুক্তি এবং মিলিট্যান্ট বক্তব্যের আকর্ষণে এগিয়ে এসেছিল, কারণ তাঁর চিন্তার এক আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে। কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেই যত সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সব পার্টিরই আছে, আপনাদের পার্টির মধ্যেও আছে। এই চরিত্র গঠন করার মানে, একজন বিপ্লবী যে মুমূর্ষু সমাজে বাস করছে, তার বিরুদ্ধে তাকে রিভোল্ট করতে হবে। প্রতিটি সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সে একজন বিপ্লবী। সব ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই তার কাছে মুখ্য। এই আদর্শ সর্বদা বাংলাদেশে প্রচার করি।

আমি আপনাদের বলি, এক সময়ে বাংলাদেশে আমি গভীর সংকটে পড়েছিলাম। সেই সময়ে আমার জীবন সংশয়ের মধ্যে পড়েছিল। কর্নেল তাহেরের মামলায় আমার নামও যুক্ত হয়ে যায়। তাহেরকে জিয়াউর রহমান ফাঁসি দেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন মিলিটারির সর্বাধিনায়ক, আবার বিএনপিরও নেতা। অনেককে কারাগারে বন্দি করেন। অনেকে আমাকে সর্তক করে বলেন, হায়দার ভাই আপনি অবশ্যই ভারতে চলে যান, এখানে থাকা বিপজ্জনক। আমি তখন বিপদগ্রস্ত। ইতিমধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রয়াত হন, আমি জানতাম না। কমরেড নীহার মুখার্জী দু'জন কমরেডকে পাঠান আমাকে জানাবার জন্য। তাঁরা আমার সন্ধান পাননি। আমি নিরাপত্তাজনিত কারণে সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুব ঝুঁকি নিয়ে কোনও রকমে আমি উত্তরবঙ্গে ঢুকলাম। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার এক মাস আগে আমাদের ছেড়ে গেছেন। আমি এই সংবাদে প্রচণ্ড ভেঙে পড়লাম। কমরেড নীহার মুখার্জী আমাকে সাহচর্য ও সান্ত্বনা দিলেন। আমি ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে এসেছিলাম। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশে আমার যোগাযোগের লোকজন আমাকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। আমি কমরেড নীহার মুখার্জীকে বললাম, আমার এখন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া উচিত। তিনি বললেন, সিদ্ধান্ত আপনি করুন। আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন থেকে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ওদেশে যাঁরা বিপ্লবী তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেলেন, আমি তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করি। যখন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে পড়েছে, কেন সংশোধনবাদ জন্ম নিল, কীভাবে তা প্রতিবিপ্লবের জমি তৈরি করে দিল, কীভাবে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সত্ত্বেও কেন সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ – এগুলি আমি তুলে ধরি। কমরেড শিবদাস ঘোষের এইসব শিক্ষা, মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের বহু ছাত্র-যুবককে আকর্ষণ করে। বহুসংখ্যায় যুবক-যুবতী আমাদের সাথে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে তিন ভাগ হয়ে যায়। অনেকেই বলতে থাকে কমিউনিজমের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা যখন মুহ্যমান, তখন বাংলাদেশে আমাদের পার্টিকেই খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছিল, খুবই সংগঠিত এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। অনেক পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, যাঁরা সৎ, তাঁরা চিন্তা করেন কেমন করে আমরা ছেলেমেয়েদের জোটাচ্ছি। তাঁরা মনে করেন যখন নতুনদের আকর্ষণ করার মতো তাঁদের কোনও যুক্তি-নীতি কাজ করছে না, তখন আমরা কেমন করে সফল হচ্ছি। একজন প্রবীণ নেতা মঞ্জুরুল আহসান খান একদিন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, হায়দার ভাই, আপনি কেমন করে এবং কী শিক্ষা দেন যে, এই সমস্ত ছাত্র-যুবকরা আপনাদের সাথে আসছে? আমি তাঁকে বলি, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেমন করে তিনি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কেমন করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আজকের দিনে কীভাবে একটি কমিউনিস্ট দল গড়ে তুলতে হবে, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র কী হবে – এসব কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁকে বলি। এভাবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে তিনি যে এক নতুন দিশা তুলে ধরেছেন, এ সবই যে আমাদের শক্তির উৎস, তাঁকে জানাই। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমরাও কখনও কখনও কিছু যুবশক্তিকে জড়ো করি, কিন্তু কিছুদিন পরে তারা আর আমাদের সাথে থাকে না।

কিন্তু এই পার্টিতেও সেই পুরনো সমস্যাই থেকে গেল। এখানেও জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্র্যাক্টিস অনেকেই করতে পারেননি। প্রথমদিকে তাঁরা কিছু দিন সংগ্রাম শুরু করেন, তারপরে তাঁরা প্র্যাক্টিসের রাস্তা পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত একদল কমরেড শিবদাস ঘোষকে অথরিটি হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন। পার্টি আবার ভাগ হয়। আমরা বাসদ (মার্কসবাদী) পার্টি গড়ে তুলি। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) গঠনেও এই সমস্যা আছে। তবে আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি। আশা করছি, একদল দাঁড়িয়ে যাবে।

আমি অন্তত ১২ বার ইউরোপে গেছি এবং সেখানে অনেক দলের অনেক নেতার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। আমি দেখেছি তাঁরা সকলেই হতাশ। (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

একজন বিপ্লবীর জীবনে সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই মুখ্য

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) তাঁদের কেউ কেউ ম্যান অফ ইন্টিগ্রিটি, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি তাঁদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছি। একজন 'হোয়াই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) ইজ দি অনলি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' অনুবাদ করতে শুরু করেন। এটা একটা নতুন জিনিস। যৌথতা ও যৌথজীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের অকৃতকার্যতার কারণ এখানেই। ইউরোপ নিয়ে গর্ববোধ এবং প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা, তাদের মধ্যে একটা বাধা হিসাবে কাজ করে আমাদের উন্নত চিন্তা, উন্নত সংস্কৃতিকে গ্রহণের ক্ষেত্রে। তাঁরা খুব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমি একবার বার্লিন থেকে রোম যাচ্ছিলাম, তা অনেকটা পথ। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ট্রেনে একটি লোক উঠে আমাকে দেখল। তারপর সে একটা পেপার বা বই বের করে বসে পড়ল। তাতেই সে নিমগ্ন, সে কথা বলবে না। ট্রেনে কোনও কথাই নেই। লম্বা ভ্রমণ, কিন্তু ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে কোনও কথা নেই। আমি এ ব্যাপারে জার্মানির এক কমরেড মিচেল ওপারস্কালস্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, তুমি জান না কেন এরকম কারণ, এরা চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এরা জানেই না পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। এটা ভাষার সমস্যা নয়, এটা তাদের সংস্কৃতির প্রশ্ন। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেমন আছেন? সে রেগে গিয়ে উত্তর দেয় আমি খুব ভাল আছি, তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ? যদি জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাবার নাম কী? সে বলবে, তুমি আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো আমার সাথে কথা বলছ, তুমি আমার বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার না। এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সেখানে, প্রতিটি মানুষই পৃথক। নেদারল্যান্ডের কমরেড ভেন্ডারক্লিফ্‌ট একজন সহৃদয় মানুষ। তিনি ১৮ নং মোস্টারহার্টে বাস করেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা। সে তাঁর কাছাকাছি অন্য একটা বাড়িতে থাকে। এতেই তাঁর পার্টির কমরেডরা তাঁকে প্রশ্ন করে, তোমার মেয়ে তোমার নিকটে আছে কেন? এর মানে হল, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে তাঁর বাবা-মার কাছে থাকতে পারে না। তাদের আলাদা পরিবারে থাকা আবশ্যক। এই রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারা চলছে ইউরোপে। মানুষ চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। কেউ ধরুন রাস্তায় কাঁদছে, আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম, আমার সাথে থাকা কমরেডরা আমাকে নিষেধ করলেন, না, না, সে রেগে যাবে। সে আপনাকে বলবে আমাকে একা থাকতে দিন। এটা আমার বিষয়। আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবেন না। এ এক সমস্যা। কমরেড আমার সামান্য ইংরেজি বিদ্যায় আমি চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে আমার কথা বলতে।

বাংলাদেশে আমাদের পার্টি আবার ২০১৩ সালে বিভক্ত হয়। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) অনেক অসুবিধার মধ্যে গড়ে উঠেছে। আসলে পুরনো পার্টির পুরনো অভ্যাস আমাদের সামনে বাধা। পুরনো অনেক কিছুই তারা এখনও বহন করছে। তবে একটা জিনিস তারা বুঝতে পারছে, আগের পার্টির অপর অংশ কোনও সঠিক পার্টিই নয়। তত্ত্বগতভাবে তারা তা বুঝছে। কিন্তু অভ্যাস, কালচার, স্নেহ-ভালোবাসা যা যেকোনও মানুষের সামগ্রিক জীবনের অংশ, তার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বীজ আছে।

আমরা আপনাদের পার্টি থেকে অনেক সাহায্য পাচ্ছি। আপনারা একটা মহান পার্টি। এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সব থেকে অগ্রণী, কারণ এই পার্টি কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই পার্টির অফুরন্ত শক্তি আছে। আছে অসীম সম্ভাবনা। সারা ভারত জুড়ে পার্টি বিকশিত হচ্ছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রতিটি লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা বড় বড় চাষী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করছে। এটা একটা অদ্বিতীয় পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে দীক্ষিত বলেই এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা। বর্তমান নেতৃত্ব সেই শক্তিতে বলীয়ান। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি হিসাবে আপনাদের দল ও আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করে। কিন্তু কেউ অপরের উপর মত চাপিয়ে দিই না। আমাদের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। আমাদের কমরেডদের কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও চিন্তায় গড়ে ওঠা উচিত। তাঁদের জীবন, অভ্যাস, সংস্কৃতি এবং সমস্ত রকমের মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অর্জন করা দরকার।

কমরেড প্রভাস ঘোষ এক্ষেত্রেও সাহায্য করেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ করছি এখানকার পার্টির এখন এক চমৎকার অবস্থা। কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুর পর বহু কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। এতদিন পরে কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র পার্টির প্রকৃত নেতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তিনি নেতায় পরিণত হয়েছেন, তা নয়। জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের যে ধারণা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, তাকেও নানা দিক থেকে তিনি বিকশিত করেছেন, নতুন নতুন সমস্যার সামনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তিনি দলকে সমৃদ্ধ করছেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে আমি মনে করি, তিনি যৌথ নেতৃত্বের আজ বিশেষীকৃত রূপ, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি আজ সংঘবদ্ধ। কমরেড প্রভাস ঘোষ একা যৌথ নেতৃত্ব হিসাবে বিকশিত হননি। তাঁর বিকাশও হয়েছে অন্যান্য কমরেডদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এবং এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে বিশেষীকৃত হয়েছে। আমি জানি আমার থেকে বেশি আপনারা এটা গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখান থেকেও কিছু শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

কমরেড নীহার মুখার্জীর পরবর্তীতে এখন তিনি দক্ষ এবং প্রাজ্ঞ নেতা, এই আমার ধারণা। এজন্য তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু, আবার আমি তাঁকে নেতা হিসাবে মানি। এই পার্টির ভবিষ্যৎ আছে। মহান মার্কসবাদী কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পার্টি গড়ে তুলেছেন। আমি আমার বক্তব্য কিন্তু গুছিয়ে একের পর এক রাখতে পারলাম না। এটা আমার লিমিটেশন। আমি ক্লাস এইট পাশ করতে পারিনি। তার পরে আমি পড়াশুনা চালাতে পারিনি। সেই জন্য আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

কমরেড, আমি আপনাদের বলি, আপনাদের হাতে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, এক শক্তিশালী হাতিয়ার আর আছে একদল শক্তিশালী নেতা। এখানেই আমি শেষ করছি। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে আমার অভিনন্দন। আমাদের পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) আমাকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলেছে যে, আমরা সেখানে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা নানা দিকে বিকাশের স্তরে আছি। সংগ্রামের পথে যদিও নানা জটিলতা এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতাও থাকে, তবু আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, বাংলাদেশে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে তুলব। আমার বয়স এখন ৮৫ বছর, আরও পাঁচ-ছয় বছর বাঁচব। (হেসে বলেন) কমরেড প্রভাস ঘোষ অবশ্য তা বিশ্বাস করে না। সে বলে যে, আমি দুই-তিন বছর পরে মারা যাব। আমি বলেছি, না, পাঁচ বছর বা আরও বেশি বাঁচব, কারণ আমি রোজ কিছু কিছু ব্যায়াম করি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন।

(সংগৃহীত: গণদাবী ৭১ বর্ষ ২০ সংখ্যা থেকে)

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৪তম কমিটি গত ২৭ জানুয়ারি গঠন করা হয়েছে। রাশেদুল কবির বাঁধনকে আহ্বায়ক ও শরিফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। আগামী দিনে ছাত্র অধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অগ্রণী সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকার করে এই কমিটি অবিলম্বে ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণ করে রাকসু নির্বাচন আয়োজনের এবং দখলদারিত্বমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তোলার দাবী জানায়। কমিটি গঠন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কবাদী) রাজশাহী জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড আতিকুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক নেতা সাজ্জাদ লিওন সরদার।

চাকুরী স্থায়ীকরণের দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংকের পিয়ন-কাম-গার্ডদের অবস্থান কর্মসূচি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কেন্দ্রীয় নেতা ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক, গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের সাবেক সদস্য আসমা বেগম। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ ব্যাংক ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী পরিষদ-এর আহ্বায়ক আজিজুল হক বাবুল। বক্তব্য রাখেন পরিষদ-এর যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইউনুস, নয়ন শিকদার, সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, উপদেষ্টা ইরাদুল ইসলাম, যশোর জোনের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম, নরসিংদী জোনের সভাপতি মো. আরিফ মিয়া, টাঙ্গাইল জোনের সভাপতি ইউসুফ আলী, সিরাজগঞ্জ জোনের মো. আজমসহ অনেকে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ব্যাংকের কর্মকর্তারা একে 'গরিবের ব্যাংক' বলে দাবি করেন। অথচ ব্যাংকটি নিজেদের গরিব কর্মচারীদের সাথে অমানবিক আচরণ ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা অফিসে পিয়ন-কাম–গার্ড হিসেবে কর্মরত তিন হাজারের বেশি কর্মচারীকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে (ঘড় ডড়ৎশ, ঘড় চধু) বছরের পর বছর ধরে কাজ করানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে (অনেকে ১৫-২০ বছরের বেশি) চাকুরি করলেও চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না। এই কর্মচারীদের কোন নির্ধারিত কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক-সরকারি-উৎসব-ঐচ্ছিক-অসুস্থতাকালীন ছুটি, বোনাস নেই। কোনরকম কারণ দর্শানো ও লিখিত অভিযোগ ছাড়া যেকোন সময় মৌখিক ভিত্তিতে ছাঁটাই করা হয়। এসবই বাংলাদেশ শ্রম আইন, আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বর্তমানে দিনে অফিসের কাজের জন্য দৈনিক ৩৭৫ টাকা, রাতে অফিস পাহারার জন্য মাসে ১০০০ টাকা ও সকালে ঝাড়ুদারের কাজের জন্য মাসে ৬০০ টাকা মজুরি দেয়া হয়। এই পদে ১০ বছরের বেশি সময় ধারাবাহিক কাজ করলে বিদায়কালীন অনুদান বাবদ মাত্র ২ লক্ষ টাকা দেয়া হবে। দশ বছর হওয়ার আগেই নানা অজুহাতে ছাঁটাই করা হয়। প্রতিটি ঈদ উদ্‌যাপন/উৎসব পালন এর জন্য সহায়তা বাবদ মাত্র ২৫০০ টাকা দেয়া হয়। চাকুরিতে যোগদানের সময় কোন নিয়োগপত্র ও ছবিসম্বলিত পরিচয়পত্র দেয়া হয় না। 'শান্তিতে নোবেল বিজয়ী' ড. মুহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালে ২০০৩ সালে স্থায়ী পিয়ন-কাম-গার্ড নিয়োগ বন্ধ করে 'দৈনিক ভিত্তিক লোক কাজে লাগানো সংক্রান্ত' সার্কুলার জারি করা হয়। সরকার নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিলেও এখনো সেই ড. ইউনুস প্রশাসনেরই ধারাবাহিকতা চলছে। অথচ, গ্রামীণ ব্যাংকের 'বিভিন্ন পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদত্যাগ প্রসঙ্গে' শীর্ষক 'নির্দেশিকা ষোল'-এর ১৬.৬.৯ অনুচ্ছেদ মতে 'দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত পিয়ন-কাম-গার্ডদের কোন অবস্থাতেই ৯ মাসের বেশি দৈনিক ভিত্তিতে রাখা যাবে না'। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ান্তে শ্রমিক/কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। কর্মচারীদের প্রশ্ন – 'এত বছর ধরে ২৪ ঘন্টা কাজ করি, তবু কেন অস্থায়ী'?

চাকুরী স্থায়ীকরণ চেয়ে ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষকে দাবিগুলো জানানো হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালের মার্চ ও জুলাই মাসে জাতীয় প্রেসক্লাব ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। তখন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আশ্বাস দিলেও স্থায়ীকরণের মূল দাবি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু আন্দোলনের সাথে জড়িতদের নানা কৌশলে অন্য জেলায় হয়রানিমূলক বদলি, চাকুরিচ্যুতি করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উচিত – বাংলাদেশের শ্রম আইন, গ্রামীণ ব্যাংকের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও সর্বোপরি মানবিক দিক বিবেচনা করে ৩০০০ দৈনিকভিত্তিক পিয়ন-কাম-গার্ডদের চাকুরী স্থায়ী করে তাদের পরিবারের সম্মানজনক জীবিকা ও ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"

চাকুরী স্থায়ীকরণের দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংকের পিয়ন-কাম-গার্ডদের অবস্থান কর্মসূচি

গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত প্রায় ৩ হাজার দৈনিক ভিত্তিক পিয়ন-কাম-গার্ডদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র-ওভারটাইম-সবেতন ছুটি-বোনাসসহ যাবতীয় সুবিধাদি প্রদান এবং আন্দোলনকারীদের শাস্তিমূলক চাকুরিচ্যুতি-বদলি বন্ধসহ ৫ দফা দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংক ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী পরিষদ-এর উদ্যোগে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি ঢাকায় প্রেসক্লাবের সামনে ও মিরপুরস্থ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ১৮ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত চলে। সারাদেশ থেকে আসা গ্রামীণ ব্যাংকের ৫ শতাধিক কর্মচারী ১৮ মার্চ সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের ফুটপাতে অবস্থান নেয়। তারা নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকে শ্রম আইন লঙ্ঘন ও গরিব কর্মচারীদের আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বন্ধ করতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ দাবি করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯ মার্চ বিকেল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনে অবস্থানের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২২ মার্চ তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করে চাকুরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড-এর পরবর্তী সভায় উথাপনের আশ্বাস দেয়। কর্তৃপক্ষ আরো আশ্বাস দেন – তাদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করা হবে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কাউকে হয়রানি করা হবে না। তবে কর্মকর্তারা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দিয়েছে যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে চাকুরী স্থায়ীকরণের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তারা ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এর আগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন – বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সিপিবি-র প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজ্জাদ জহির চন্দন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বায়ক শামীম ইমাম, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, সমন্বিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন নেতা রফিকুল ইসলাম পথিক, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডাকসু: ভোট জালিয়াতির নির্বাচন

বহুল প্রতিক্ষিত ডাকসু নির্বাচন শেষ হলো। হাজারো অনিয়ম ও জালিয়াতির ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল–নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি। নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমসমুহে ছড়িয়ে পড়া বক্তব্য, ছবি ও ফুটেজ থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়। জালিয়াতির আশঙ্কা থেকেই শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের আগের দিন উপাচার্যের সাথে দেখা করে তিনটি দাবির কথা জানিয়েছিল। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, নির্বাচনের দিন ব্যালট পেপার কেন্দ্রে পৌঁছানো ও আঙুলে অমোচনীয় কালি ব্যবহার করা। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দাবি তিনটি অগ্রাহ্য করে।

কেন দাবি গুলো মানা হয়নি তা ভোটের দিন সকালেই পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে প্রার্থীদের ব্যালট বাক্স দেখিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। তাই সকাল আটটার আগে ব্যালট বাক্স দেখানোর দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা। কিন্তু হল কর্তৃপক্ষ এতে রাজি হয়নি। তাদের রাজি না থাকার কারণটা পরে বোঝা গেল, যখন ছাত্রীরা হলের রিডিং রুম থেকে এক বস্তা ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার উদ্ধার করে। সেসব ব্যালটে ছাত্রলীগ সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী সংসদ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়া ছিল। বেগম রোকেয়া হলের টিভি রুমের পাশে একটা কক্ষে পাওয়া গেল ৩ বাক্স খালি ব্যালট। খালি ব্যালট অন্য কক্ষে পাওয়া যাবে কেন? ছাত্রীরা সকাল থেকে ব্যালট বাক্স পরীক্ষা করে ভোট শুরু করার দাবি করতে থাকে। তাদের কথা শোনা হয়নি। ছাত্রীরা এ নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। ফলে ১২টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকে।

স্যার এ এফ রহমান হলে বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা যখন কেন্দ্র পরিদর্শনে যায়, তখন ছাত্রদের দুই থেকে আড়াই ঘন্টা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। লাইনের মধ্যে কোথাও দেখা যায় ছাত্রলীগের কর্মীরা ভোটারদের কলা (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফসলের লাভজনক দাম, কৃষি বাজেট বৃদ্ধি, চাষীর সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, ক্ষেতমজুরদের কাজ ও রেশন, ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দসহ ৯ দফা দাবিতে

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের স্মারকলিপি পেশ

কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর বাঁচাতে ৯ দফা দাবিতে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১০ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এর পূর্বে সকাল ১১টায় ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক সাজ্জাদ জহির চন্দনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাইফুল হক, মঞ্জুরুল হক মিঠু, এড. আনোয়ার হোসেন রেজা, লিয়াকত হোসেন, ফিরোজ আহসান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুর ও দেশ বাঁচাতে সংগ্রাম পরিষদের ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান, যার মধ্যে রয়েছে – ১. ধান-আলুসহ কৃষি ফসলের লাভজনক দাম; প্রতি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র চালু করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে ফসল ক্রয়। সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ। জাতীয় বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। ২. ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ; স্বল্পমূল্যে গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা ও ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু। দুস্থভাতা-কাবিখা-কাবিটা-ভিজিএফ-ভিজিডি-টেস্টরিলিফ-বয়স্কভাতাসহ সকল গ্রামীণ প্রকল্পের দুর্নীতি, অনিয়ম, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বন্ধ। ৩. খাসজমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে সমবায়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ। বেকার যুবকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান। ৪. ভূমি অফিস, তহসিল অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, পল্লীবিদ্যুৎ ও ব্যাংকঋণের দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ। পুলিশী হয়রানী-জুলুম-নিপীড়ন, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার-গ্রেপ্তার বাণিজ্য বন্ধ। ৫. কৃষকের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদাসলে মওকুফ। শস্যবীমা চালু। এনজিও ও মহাজনী ঋণের হয়রানী বন্ধ। ৬. কৃষিজমি অকৃষি খাতে ব্যবহার রোধ। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন। আখচাষিদের রক্ষা, বকেয়া পাওনা পরিশোধ। আম চাষিদের রক্ষায় ব্যবস্থা। নদী-খাল খনন, দখল-দূষণ বন্ধ, নদীভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা। হাওর সমস্যার স্থায়ী সমাধান। ৭. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূর; লবণাক্ততা রোধে ব্যবস্থা। তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়; বাংলাদেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা। ৮. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি; মাতৃভাষায় শিক্ষা ও ভূমির অধিকার এবং জানমালের নিরাপত্তা। ৯. নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধিনে দ্রুত পুনঃনির্বাচন; জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না বাম গণতান্ত্রিক জোট ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

উপজেলা নির্বাচন ও সিটি কর্পোরেশন উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলনে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় মৈত্রী মিলনায়তন, মুক্তিভবন এ অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় – আওয়ামী লীগ ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। কারচুপি, জালিয়াতি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি সকল বিষয়কে ছাপিয়ে এটি ছিল ভোটের আগের রাতে ব্যালটবাক্স ভরে রাখার এক নতুন কীর্তি। এই কলংকিত নির্বাচনের দগদগে ঘা শুকানোর আগেই এবং জনগণের ভোটাধিকার কোনরূপ নিশ্চিত না করেই উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন – গত একাদশ সংসদ নির্বাচন যেভাবে হয়েছে, আগামী নির্বাচনও সেভাবেই অনুষ্ঠিত হবে। আমরা আরও একটি প্রহসন ও তামাশার খেলায় সামিল হতে চাই না বিধায় এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ। উপস্থিত ছিলেন শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন, হামিদুল হক, বাচ্চু ভূইয়া, আকবর খান, লিয়াকত হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org